Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, April 2025, Page No. 104-110
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মনের কথা নয়, আঁতের কথা, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি': একটি সমীক্ষা

ড. মনোয়ার আলী, *সহকারী শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.04.2025; Accepted: 28.04.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore's 'Chokher Bali' is a modern psychological novel. In this novel, he revealed the philosophy of the new stage of literature. Here the novelist has not only given the details of the events, but also analysed and presented the extract of each character's 'Anter Katha'. The main characters of the novel, Binodini– Bihari, Asalata– Mahendra, the tension of their mutual relationship and the evaluation of the events have revealed the nature of the heart in every chapter of the novel. Also, among other characters Rajlakshmi and Annapurna, their characteristic change has been observed with the change of events. From Rajlakshmi's mother's jealousy to the end, the novelist has revealed the pure side of the mother's heart. In this novel, Annapurna is a female character who stands above the world. So, in the end, the novelist has taken initiative to take Binodini to Kashi as a shelter and has drawn a happy ending of the novel. Also, Binodini's perverted needs have finally resulted in her transformation from demon form to goddess form. Even in Mahindra fickle mind, stability emerges through the tension at the end of the novel. The intelligent Bihari has finally weakened the power to express the love of the heart. The most radical change is seen in the character of the girl Asalata. Binodini, who was playfully called the apple of his eye, after developing into a perfect woman, has truly become the apple of his eye. After all, it can be said that the novel 'Chokher Bali' is a living example of the change in character traits through a thorough analysis of events. So, it can be said that the novel Eyeball is a wonderful creation of Rabindranath's modern social psychological novel.

Keywords: Modern, Psychological, Novel, Philosophy, Literature, Evolution, Nature, Social.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' উপন্যাসে সমাজের ও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সংস্কারের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের বিরোধ ধরা পড়েছে। এই উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের জগতে শিল্প উৎকর্ষের দিক থেকে উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এখানে ঔপন্যাসিক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের থেকে চরিত্রের অন্তরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব এবং অবশেষে তার পরিণতির গুরুত্ব দেখিয়েছেন; যা উপন্যাসটিকে আধুনিকতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁচেছে। 'চোখের বালি' উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে অন্তরদ্বন্দ্ব, চরিত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও প্রকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাই এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। আবার এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক সমস্যানিষ্ঠ উপন্যাস। তার আগে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের বিষয় ছিল ঘটনা নির্ভর। এই আদর্শে 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' রচিত। 'চোখের বালি' উপন্যাসে চরিত্রের কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণের দ্বারা তাদের চিত্ত গহণের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এ ধরনের বিশ্লেষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চোখের বালি' উপন্যাসের 'সূচনা' অংশে লিখেছেন-

> "সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরা বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"[১]

অর্থাৎ এখানে উপন্যাসিক আঁতের কথাই তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। চরিত্রের অন্তরের কথাই যখন প্রকাশিত হয় তখন সাহিত্যের উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

> "মানুষের অন্তর আত্মার প্রতিফলন সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্তরবাসী মানুষকে যিনি জানেন চেনেন, তিনি যে মানুষের সমগ্র সত্তাকে উপলব্ধি করেন তাই নয়, তিনি সর্বৈবভাবে আংশিকতা দুষ্ট মানুষের চিত্রাঙ্কন পরিহার করে চলেন। মানুষ মনোময় নয়, দেহময় নয়, অন্নময় নায়- এমন কি মানুষ আত্মসর্বস্বও নয়। সমগ্র সত্তার প্রতিফলনই কাম্য।"[২]

মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীর আদরের সন্তান। তাকে সে মানুষ করেছে ক্যাঙ্গারু শাবকের মতো। রাজলক্ষ্মী পুত্র স্নেহে এতটাই মরিয়া ছিল যে পুত্র মহেন্দ্র তাকে ছেড়ে বিয়ে করতে চাইতো না কখনোই। এই বিষয়ে গর্ববোধ করতো রাজলক্ষ্মী। এমনকি নিঃসন্তান জা অন্নপূর্ণাকে এ বিষয়ে খোটা দিতেও ছাড়েনি। পুত্র স্নেহান্ধ রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রর সমস্ত অন্যায় আবদারকেও প্রাধান্য দিতো অনায়াসেই। তাই বিহারীর সঙ্গে বিবাহ ঠিক হওয়া আশালতাকে নিজের পুত্র মহেন্দ্রর আবদারে নিজের পুত্রবধূ করতেও পিছপা হয়নি কোন মতোই রাজলক্ষ্মী। আসলে রাজলক্ষ্মী চেয়েছিলেন নিজের পুত্রবধূকে নিজের আয়ত্তে রেখে পূর্বের মতোই পুত্রকে নিয়ে একনায়কত্বভাবে নিজের দৈনন্দিন সংসার জীবন চালাতে। তাই অন্নপূর্ণার ভাইঝির সঙ্গে মহেন্দ্রর বিয়েকে প্রথম থেকে রাজলক্ষ্মী ঈর্ষান্বিত চোখে দেখেছে। পারিবারিক জীবনে পুত্রবধূ ও শাশুড়ির সম্পর্ক প্রায় বেশিরভাগই আদায় কাঁচকলা সম্পর্কের মতো। কেননা একজন চিরকালীন তার অধিকারকে ছাড়তে চায় না, আর অপরজন সংসারে প্রবেশ করে নতুনত্বের দাবি নিয়ে। এই টানাপোড়েনেই অনেক সময় মায়ের ঈর্ষা প্রবল হয়ে ওঠে; যা আমরা রাজলক্ষ্মী চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করেছি।

আশালতা এক সরল বালিকা। এই অনাথা মেয়েটি নতুন সংসার জীবনে পদার্পণ করে যেন অথৈ সাগরে পড়ে। তাই একটুখানি কুলকিনারার জন্যই হয়তো আশ্রয় নিতে চাইতো পিসিমা অন্নপূর্ণার কাছে। এই বিষয়টিও রাজলক্ষ্মী একেবারেই ভালো চোখে দেখতো না। পুত্র সৌভাগ্যবতী নারীর অন্তরের নিগূঢ়তত্ত্ব কথাকে যেন নিঁখুতভাবে রবীন্দ্রনাথ বের করে নিয়ে এনে এসেছেন রাজলক্ষ্মীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মহেন্দ্র যখন নতুন বউকে নিয়ে সংসার জীবনে পুতুল খেলার মতো মেতে উঠেছিল তখন মাতৃভক্তি কমে যাওয়ায় রাজলক্ষ্মীর মধ্যে দেখা দেয় পুত্রবধু আশাতার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা। এই বিতৃষ্ণা থেকেই ঈর্ষাকাতর রাজলক্ষ্মী আরও প্রবলভাবে অধিকার খাটাতে চায়। উপন্যাসটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে আরও জানা যায় যে রাজলক্ষ্মী কেবল যে মায়ের ঈর্ষা থেকেই অন্তরের অতৃপ্তি প্রকাশ করেছিল তা নয়,- সংসারের প্রতি তার সর্বগ্রাসী একচেটিয়া অধিকার যাতে সারা জীবন অক্ষুন্ন থাকে এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টিও রাজলক্ষ্মী চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে। রাজলক্ষীর যে আঁতের কথার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ এখানে বেশি করে দেখিয়েছেন তা কেবল নিঃস্বার্থ মাতৃস্নেহের বিষয়টি নয়। কারণ ঘটনা পরম্পরায় রাজলক্ষ্মীর পুত্রের প্রতি তীব্র স্নেহের সঙ্গে মিশে গেছে কূটনৈতিক স্বার্থপরতা। নিজের ঈর্ষাকে এবং আত্মকেন্দ্রিকতাকে বড় করতে গিয়ে নিজের সংসারে রাজলক্ষ্মী রোপন করেছে বিষবৃক্ষের চারা। ননীর পুতুল আশালতার হাত থেকে মহেন্দ্রকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য মা হয়েও রাজলক্ষ্মী বিধবা বিনোদিনীকে যেন লেলিয়ে দিয়েছে পুত্র মহেন্দ্রর প্রতি। মায়ের মতো কেবল যদি নিঃস্বার্থপরতা রাজলক্ষ্মী চরিত্রের মধ্যে থাকতো তাহলে নিজের পুত্রের খুশিতে সে খুশি হওয়ার চেষ্টা করত সব সময়। ঈর্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মঅহংকারও যেন পাহাড় সমান বিশাল হয়ে উঠেছিল রাজলক্ষ্মীর মনে।

পুত্রবধু আশালতাকে পুত্র মহেন্দ্র যখন একেবারে সমস্ত দিন তাকে আঁকড়ে ধরে থাকত তখন পুত্রের এই আচরণকে রাজলক্ষ্মী কখনোই সহ্য করতে পারেনি। তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অপবাদও দিয়েছিল সে। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর অন্তরের ছলচাতুর্য ও নানা ফন্দিফিকিরকেও রাজলক্ষ্মী চরিত্রের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে দেখিয়েছেন। উপন্যাসে আমরা লক্ষ করি কোন উপায় না দেখে তিনি পুত্রবধূ আশালতাকে ঘর কন্যার কাজে অতিরিক্ত ভাবে নিয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। তবে এখানেও মহেন্দ্র সুকৌশলে বাধ সাধলে এবারে মাতৃহৃদয়ের ক্ষোভ ও রাগ অভিমানের পর্যবসিত হয়। তবে পূর্বের অভ্যাস মতো ছেলে কিন্তু মায়ের অভিমান ভাঙাতে আসে নি। তা সত্ত্বেও স্নেহবাৎসল্য পরায়ণ রাজলক্ষ্মী এক গভীর আশায় ভাবনা করে যে তার ছেলেও তার প্রতি অভিমান করেছে। এই অভিমান ভাঙানোর ইচ্ছা রাজলক্ষ্মী নিজের থেকে অন্তরে পোষণ করে এবং উপযাজক হয়ে মহেন্দ্রকে খুশি করার ইচ্ছায় তার ঘর গুছিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় করে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-

> "এ কয়দিন মা তাহার কাপড় গোছানো বিছানা তৈরি, ঘর দুয়ার পরিষ্কার করায় সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছিলেন। কয়দিন মাতৃস্নেহের চিরাভ্যস্ত কর্তব্য গুলি পালন না করিয়া তাহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল।"[৩]

তবে এখানেও রাজলক্ষ্মী একেবারে আঘাতে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ মান-অভিমানের চরম কল্পনায় রাজলক্ষ্মী যখন আকাশ কুসুম স্বপ্ন গড়ে তুলেছে তখন মহেন্দ্র অলস দুপুরে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে অনায়াসে সময় অতিবাহিত করেছে। এখানেই স্বামী সৌভাগ্যবতী নববধূকে স্বামীর সোহাগ পেতে দেখে মাতৃহৃদয় যেন আরও ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠেছে। আসলে এই হিংসা আপন গুণে স্ত্রীর অনায়াসেই স্বামীর হৃদয়ের সিংহাসন অধিকার করে নেওয়ারই যেন ফল। যে উচ্চ আসনে এতদিন গর্বের সঙ্গে রাজলক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ছিলেন এক ঝটকায় যেন তা এক নববালিকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ নবীন ও প্রবীণের মনস্তাত্ত্বিক দিক খুবই সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত করেছেন।

রাজলক্ষ্মী ঘর-সংসারের টানাপোড়েনে ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ করে জা অন্নপূর্ণার প্রতি এবং চরম অভিমান বশত: নিজের জন্মভূমি বারাসাত চলে যেতে সংকল্প করেন। উপন্যাসের মধ্যে এ পর্যন্ত গতানুগতিক সামাজিক চিত্রের প্রতিফলনে লক্ষ করা যায়। কিন্তু এর পরবর্তী পর্বের ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে 'চোখের বালি' উপন্যাসের অভিনবত্ব বা নতুনত্ব ধরা পড়ে। চোখের বালি জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিটি চরিত্রের নিছক মনের কথা শুধু তুলে ধরেননি। আসলে এই উপন্যাসটিতে তিনি চরিত্র গুলির আঁতের কথাকে নিংড়ে নিয়েছেন। আঁতের কথা বলতে বোঝায় সমাজের যে সমস্ত চিরাচরিত নিয়ম-কানুন রয়েছে তার বাইরে গিয়ে মানুষ তাদের অতি সূক্ষ্ম ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতিকে এবং জটিল মানসিকতাকে প্রকাশ করে; যার পরিচয় আমরা পাই প্রথম বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে। উপন্যাসের শুরুতে জানা গিয়েছিল বিনোদিনীর সঙ্গে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রর বিবাহ ঠিক করে কিন্তু একেবারে বেঁকে বসায় শেষ পর্যন্ত বিষয়টি সম্পন্ন হয়নি। ঘটনাচক্রে বিনোদিনী বিধবা হয়ে বারাসাতে রয়েছে। এখানে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলে বিনোদিনীর অতিশয় ক্লান্ত শীর্ণ শরীর দেখে আফসোস করে। তবে এই দুই নারী একে অপরকে পেয়ে যেন অতিশয় পারস্পরিক আশ্রয় খুঁজে পায়। বিনোদিনীর সেবায় আপ্লুত হয়ে রাজলক্ষ্মী তার প্রতি আবেগ বশত বলেছিল-

> "মা তুই আমার ঘরের বউ হলিনে কেনো, তা হইলে তোকে বুকে করিয়া রাখিতাম।"[৪]

বিধবার প্রতি এই স্বতঃস্ফূর্ত মনের আবেগ উপন্যাসে নতুনত্ব এনে দিয়েছে। কেননা ঔপন্যাসিক এই উক্তির মধ্যে দিয়েই যেন সমাজের চিরাচরিত নিয়মকে আঘাত করে করতে চেয়েছেন।

বিনোদিনী সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

> "বালবিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ এবং তার মানসিক পরিবর্তনের টানাপোড়েন এই উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"[৫]

বিনোদিনী সুন্দরী, সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী নারী। নিজের অকাল বৈধ্যবকে বাহ্যিকভাবে মেনে নিলেও তার অন্তরের মধ্যে সর্বদা চলছিল অন্য এক চাওয়া-পাওয়ার তৃষ্ণা। তার পরিচয় পাওয়া যায় রাজলক্ষ্মীকে লেখা মহেন্দ্রর চিঠি পাঠের মাধ্যমে। কারণ সেই চিঠির মধ্যে মহেন্দ্র মায়ের কথা দু'লাইন লিখেই তার ও আশালতার ঘর কন্যা এবং আদর আলাপের যে বর্ণনা দিয়েছিল তা নিস্তব্ধ দুপুরে বালিশের উপর উপুড় হয়ে পড়তে পড়তে বিনোদিনী যেন মাতালের মতো মরিয়া হয়ে উঠেছিল। যাই হোক অবশেষে নিজের বুদ্ধি কৌশলে হোক আর রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষাজনিত কারণেই হোক, বিনোদিনী- মহেন্দ্র ও আশালতার সংসারে এসে প্রবেশ করে। বুদ্ধিমতী বিনোদিনী কয়েকদিনের মধ্যেই রাজলক্ষ্মীর মন অতি সুকৌশলে সরলা বালিকা আশালতার সঙ্গে ভাব জমিয়ে একেবারে তার ঘরের মধ্যে জায়গা করে নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বিহারী বিনোদিনীকে প্রথম থেকেই বুঝেছিল। তাই সে বলেছিল যে, এ নারী খেলা করিবার নয় তাকে উপেক্ষা করাও যায় না। ধীরে ধীরে বন্ধুত্বের ছলনার আড়ালে ও আশালতার সরলতার সুযোগে বিনোদিনী মহেন্দ্রর পারস্পরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। দুর্বল চিত্তের অধিকারী মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রেমে এতটাই মরিয়া হয়ে উঠে যে শেষ পর্যন্ত সে প্রায় উন্মাদের মতো হয়ে যায়। তবে মহেন্দ্রর চিরকালীন বন্ধু বিহারী এর আভাস অনেক আগেই পায় এবং তাকে সাবধানও করে। উচ্ছ্বসিত আবেগে বিহারী একবার মহেন্দ্রকে বলে-

> "মহিন দা, নিজের সর্বনাশ করিতে চাও করো- বরাবর তোমার সেই অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে সরল হৃদয় সাদ্ধী তোমাকে একান্ত বিশ্বাসে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার সর্বনাশ করিও না। এখনো বলিতেছি তাহার সর্বনাশ করিও না।"[৬]

অর্থাৎ ঔপন্যাসিক একদিকে যেমন বিকৃত মানসিকতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিনোদিনীকে উপস্থাপিত করেছেন, অন্যদিকে আবার বিহারীর মতো আত্মসচেতন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন এক পুরুষ চরিত্রকে তুলে ধরেছেন।

বিহারীর শুভ প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করেই মহেন্দ্রর মতো সংযমহীন পুরুষকে ছলে বলে কৌশলে বিনোদিনী নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে। সরলা আশার সরল বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে মিথ্যে ঘুমানোর বাহানা করে মহেন্দ্রকে নিজের ছবি তোলার সুযোগ করে দেয়। চতুরা বিনোদিনী ভান করে যে তার অজ্ঞাতেই যেন মহেন্দ্র আশার বুদ্ধি কার্যকর হয়েছে। এভাবেই মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনীর প্রথম আলাপ হয়েছিল। নিজের কর্মদক্ষতা, সেবাপরায়ণতা এবং বুদ্ধির কারণে আশ্রিতা বিনোদিনী ধীরে ধীরে সংসারে একজন প্রধান সদস্যা হয়ে ওঠে। মহেন্দ্রর চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণে বিনোদিনীরও কামনা দগ্ধ যৌবন হয়তো উদ্ভাসিত হয়েছিল। কিন্তু ঔপন্যাসিক মনের এই সহজ তত্ত্ব কথা ছাড়িয়ে চরিত্রের আত্মার স্বরূপ নিংড়ে নিয়ে এসেছেন। কারণ উপন্যাসে উল্লেখিত চড়ুইভাতের ঘটনার দিন বিনোদিনীর বিকৃত মূর্তি ছাপিয়ে যেন এক সরল প্রকৃতির নারী মূর্তির রূপ উদ্ভাসিত হয়। আসলে তার অশান্ত হৃদয় দমন হয়ে যেন এক নতুন জন্মের সৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে ছলাকলাময়ী এই নারী চরিত্র প্রথম শরীর নয়, নিজের আত্মার স্বরূপকে দেখতে পেয়েছিল। সেকারণে সৌম্যক্রান্তি বিহারীর প্রতি এক শ্রদ্ধা অনুভব করে। এখানে ঔপন্যাসিক নতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন। কারণ যে বিনোদিনী কামনা-বাসনার ফাঁদে ফেলে মহেন্দ্রকে বাঁধতে চেয়েছিল সেই আবার প্রেম ও পূজার ভক্তি দিয়ে বিহারী কেউ পেতে চেয়েছিল একান্ত নিজের করে। বিনোদিনীর দ্বারা সৃষ্ট জটিল পরিবেশে মহেন্দ্রও যখন অতিষ্ঠ হয়ে বাসা বাড়িতে চলে যায় তখন বিনোদিনীর আর এক রূপ উদ্ভাসিত হয়। তার অকালবৈধব্য ও ক্ষুধিত যৌবন লালসা মিশে তার মধ্যে এক হিংস্র মূর্তি যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল তা এবার আত্মপ্রকাশ করে। এখানে বিনোদিনীর অন্তরের এক নতুন রূপ ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলেছেন। বিনোদিনী বুঝতে পারে মহেন্দ্রকে দগ্ধ না করলে তার আত্মার শান্তি নেই। ঘটনাক্রমে মহেন্দ্র বিনোদিনীর এই প্রেম প্রেম খেলা সরলা আশালতার কাছে প্রকাশ হয়ে যায়। মহেন্দ্র গোপনে যে চিঠি বিনোদিনীকে লিখেছিল তার প্রত্যুত্তর চিঠিটি আশালতা পড়ে নেওয়ার ফলে আশার সমস্ত জগত যেন এক মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কারণ সেখানে স্পষ্ট লেখা ছিল-

> "তুমি লিখিয়াছো আমাকে ভালোবাসো। খেলার বেলায় সে কথা শোনা যাইতে পারে- কিন্তু যদি সত্য বলিতে হয় ও কথা বিশ্বাস করি না। একসময় মনে করিতে, তুমি আশাকে ভালোবাসতেছো- সেও মিথ্যা। এখন মনে করতেছো, তুমি আমাকে ভালবাসিতেছো- এও মিথ্যা। কেবল তুমি নিজেকে ভালোবাসো।"[৭]

এই ঘটনার পরেই আশাকে ঔপন্যাসিক নতুন রূপে গড়ে তুলেছেন। কেবল আশা নয়, এরপর রাজলক্ষ্মীর কাছেও সমস্ত যখন পরিষ্কার হয়ে যায় তখন পুত্রবধূর প্রতি রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষা কথায় যেন কর্পূরের মতো উঠে যায়। যে বিনোদিনীকে রাজলক্ষ্মী একদিন সেবা পরায়ন বলে অভিহিত করেছিল তাকে এখন তার মায়াবিনি বলে মনে হয়। তবে বিনোদিনী যেন এখানে সত্যভাষী ও দৃঢ়চেতা নারী। তাই সে 'মায়াবিনী' শব্দটির প্রত্যুত্তরে নিজেকে সংবরণ করে বলে-

> "সে কথা ঠিক পিসিমা, কেহ কাহাকেও জানেনা। নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই। একবার ঠাওর করিয়া দেখো দেখি। ...পিসিমা আমরা মায়াবিনীর জাত, আমার মধ্যে কী মায়া ছিল তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছো ,তোমার মধ্যেও কী মায়া ছিল তা তুমি ঠিক জানো নাই, আমি জানিয়াছি। ...ফাঁদ আমিও কতটা জানিয়া এবং কতটা না জানিয়া পাতিয়াছি।ফাঁদ তুমিও কতটা জানিয়া এবং কতটা না জানিয়ে পাতিয়াছো। আমাদের জাতের ধর্ম এইরূপ- আমরা মায়াবিনী।"[৮]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে নারী চরিত্রের মধ্যে একেবারে আঁতের কথাকে বের করে আনলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চোখের বালি' উপন্যাসে একেবারে আধুনিকতার সঞ্চার করেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র এখানে প্রতিটি চরিত্রের মনের কথাকেই পারম্পরিকভাবে বিবৃত করেননি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথাকে বের করে নিয়ে এসেছেন। বঞ্চিত, হতাশাগ্রস্থ হৃদয় নিয়ে বিনোদিনী যখন মহেন্দ্রর সঙ্গে এক উন্মুক্ত খেলায় মেতে উঠেছিল এবং সম্পূর্ণভাবে মহেন্দ্রকে আত্মস্থ করতে পেরেছিল তখনই তার ভুল ভাঙ্গে। মুহূর্তকালে সে বুঝে গিয়েছিল যে মহেন্দ্র দুর্বল এবং আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তি। তাই বিনোদিনীর নারী হৃদয় বিহারীর প্রেমকে সর্বোতভাবে গ্রহণ করতে আবার মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বিহারীকে যেন পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করতে বিনোদিনী তপস্বিনী হয়ে ওঠে। বিনোদিনীর চরিত্রের এই নতুন দিক এখানেই মনস্তাত্ত্বিকতা ছাড়িয়ে আঁতের কথার জয় হয়েছে। বিনোদিনী জানত বিহারের কাছে নিজেকে সমর্থন করতে না পারলে তার মুক্তি নেই। তাই যে রাত্রে বিনোদিনী পালিয়ে গিয়ে বিহারীর কাছে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখানে সে থাকতে চাইলে বিহারী তাকে ভদ্রতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে, যা বিনোদিনী সহ্য করতে না পেরে মরিয়া হয়ে বলে-

> "ওইটুকু দুর্বলতা রাখো ঠাকুরপো। একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।"[৯]

সেই রাত্রিতেই সমস্ত আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে বিনোদিনী যে উদ্ধত্য চুম্বন বিহারী ঠোঁটের কাছে তুলে ধরেছিল সংযমশীল বিহারী তাও পরিহার করে অনায়াসে। আসলে বিহারীর অন্তরে বিনোদিনীর প্রতি প্রেম ছিলনা তেমনটা নয়। এখানে বিহারীর আঁতের কথার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট বলা যায় যে, তার প্রেম দেহকেন্দ্রিক নয় বরং হৃদয়ের এক স্বচ্ছ কল্পনার প্রেম মূর্তি বিহারী তৈরি করেছিল। বিহারীর মধ্যেও যে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত অবস্থায় ছিল তা বিনোদিনী ওষ্ঠ চুম্বন না করলেও মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রে অবশ্যই নাড়া দিয়েছিল।

ঘটনা পরম্পরায় বিহারীর আঁতের কথা আরও প্রকট হয়ে ওঠে উপন্যাসে। বিনোদিনী বুদ্ধিমতী নারী হলেও বিহারীর অন্তরাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে কখনোই বুঝে উঠতে পারেনি। তাই বিনোদিনীকে একসময় আশালতা সম্পর্কে ভাবতে দেখা যায় যে, কিবা আছে এই ননীর পুতুলের মধ্যে যে সবাই একে ভালোবাসে। আসলে বিহারীর হৃদয়ে আশালতার জন্য প্রেম ছিল না, প্রবল স্নেহ ছিল; একথা বিনোদিনী মন প্রাণে উপলব্ধি করেনি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিহারী শুভ বুদ্ধির প্রতীক। তাই যখন আশার সংসার নষ্ট হতে বসেছে তখন তার সরল মুখচ্ছবি মনে করে বিহারীর মনে বিনোদিনীর প্রতি ধিক্কার সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিহারীরও রক্ত মাংসের গড়া মানুষ। বিনোদিনীর প্রেমকাতর দুটি হাত মনে করে বিহারীর আঁতের কথার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে এভাবে-

> "এমন সুন্দর প্রেমের সংসার ছারখার করে দিলি... আমি তোমাকে ভালোবাসি। সমস্ত জগতের আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি। কিন্তু এই কি জবাব হইল। এই কথাই কি একটি ভগ্ন সংসারে নিদারণ আর্তস্বরকে ঢাকিতে পারে। পিশাচী!"[১০]

তবে 'পিশাচী' শব্দটি বিহারী উচ্চারণ করলেও তার অন্তরের মধ্যে কিন্তু একটুখানি আদর অবশ্যই মিশ্রিত ছিল। তাই হয়তো শেষ পর্যন্ত সমস্ত দিক রক্ষা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, পিশাচী বিনোদিনী দেবীতে পরিণত হয়েছে। কেননা অনেক ঘটনার টানাপোড়েন হলেও বিনোদিনীর মধ্যেও শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছিল। তাই অবশেষে তার চিরবুভুক্ষ অতৃপ্ত নারী হৃদয়কে দমন করে মহেন্দ্রকে প্রত্যাখ্যাত করে অন্তরে বিহারীর মূর্তি প্রতিস্থাপিত করতে পেরেছিল। মহেন্দ্র চিরকালেই মাতৃস্নেহে, কাকিমার আদরের প্রশ্রয়ে নিজের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করার উপলব্ধি শিখেনি। তাই হয়তো বা তার চিত্ত দমন বিষয়টি কম দেখা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্র নিজ ঘরে ফিরেছে এবং নিজের ভুলে অনুতপ্ত হয়ে মায়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে। এই পর্যায়েও রাজলক্ষ্মীর অন্তরে প্রকৃত ভাবটি ধরা পড়ে। কেননা এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অভিমান ভুলে গিয়ে পুত্রকে ক্ষমা করে পুত্রবধূ আশালতাকে পুনরায় তার হাতে তুলে দেয়। রাজলক্ষ্মী আশালতার উদ্দেশ্যে বলে-

> "বউমা, আমার কাছে আর লজ্জা করিও না। আর মহিনের প'রেও মনের মধ্যে কোনো অভিমান না রাখিয়া একবার এখানে বসো- আমার চোখ জুড়াও মা।"[১১]

এখানেই মাতৃহৃদয়ের প্রকৃত আঁতের কথা প্রকাশিত হয়েছে।

উপন্যাসের মধ্যে বিহারী বিনোদিনীর যে অস্পষ্ট সম্পর্কের স্বরূপ ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন সেখানে বিহারীর আঁতের কথাও ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বিহারী বিনোদিনীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছে সত্যি এবং ঘৃণা করে তাকে একসময় 'নাটকের নায়িকা' বলে অভিহিত করলেও পরবর্তীতে তার শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই প্রকাশিত হয়েছে। বিহারীও মনে মনে বিনোদিনীকে ভালোবেসেছিল। তাই সম্পূর্ণরূপে তাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। বরং মহেন্দ্র ও বিনোদিনী কোন এক বাসায় একসঙ্গে রয়েছে ঘটনা পরম্পরায় বিহারীর কাছে এই ঘটনাটি উদ্ভাসিত হলে খানিকটা তার মধ্যে ঈর্ষা ও ঘৃণার ভাব জন্ম হয়েছে। তবে সেখানেও বিনোদিনী বিহারীকে নিজের মনের গোপন কথা জানাবার চেষ্টা করে এইভাবে-

> "ঠাকুরপো, যাহা মনে করিতেছো তাহা নহে। এ ঘরে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে একদিন শয়ন করিয়াছিলে- এ ঘর তোমার জন্যই উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি।"[১২]

এই পর্যায়ে এসেই দেবীরূপ বিনোদিনীর আঁতের কথা গুলি প্রকাশিত হয়েছে অনাড়ম্বর ভাবেই। এখানেই বিনোদিনী নিঃসংকোচে বলতে পেরেছে যে, আমাকে তোমার পায়ে ঠাই দাও ঠাকুরপো। বিহারী ও তার অন্তরের কথা প্রকাশ করেছে বিনোদিনীর কাছে। কারণ কোনো প্রমাণ ছাড়াই বিহারী জানিয়েছে যে, সে বিনোদিনীকে বিশ্বাস করে। বিনোদিনীর আত্মার কথা যে, সত্যিই স্বচ্ছ জলের মতো পবিত্র ছিল তা বোঝা যায় এইভাবে যে, বিহারী তাকে বিয়ে করতে চাইলে বিনোদিনী নিঃসংকোচে বলতে পেরেছে-

> "আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, একখনো হইতেই পারে না।"[১৩]

গোপীকানাথ রায়চৌধুরী 'চোখের বালি' উপন্যাসের নর-নারীর জটিল রহস্য সম্পর্কে বলেছেন-

> "চোখের বালিতে এসে বাইরের ঘটনার চেয়ে নরনারীর রহস্য জটিল গহন মনোলোক তার অন্তর মুখী শিল্পী সত্তার বিশ্লেষণের সামগ্রী হয়ে উঠলো।"[১৪]

উপন্যাসের প্রথম দিকে আশালতা চরিত্রটির ব্যক্তিত্বের বিকাশ তেমন পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বালিকা আশা নারীতে পরিণত হয়েছে। আশার জড়তা, বালিকা সুলভ লজ্জা, ভয় সমস্ত কিছুই যেন খসে পড়েছে। যে বিনোদিনীকে সে 'গুরু' বলে মানত, নিজের স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপোড়েন যখন জানতে পারে তখন অনায়াসেই সেই বিনোদিনী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই পর্যায়ে এসে আশালতার পরিণত সত্তার বিকাশ হওয়ার ফলে সে আশ্রয় গ্রহণ করেছে শাশুড়ি এবং মাসিমা অন্নপূর্ণার কাছে। এখানেই সংসার সামলে রাখার জন্য নারীর অন্তরের ভাব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। ইতিমধ্যে মহেন্দ্র নিজের মোহ কাটিয়ে সংসার জীবনে ফিরে এসেছে। রঙ্গমঞ্চের এই স্তরে বিনোদিনীকে না দেখে আশালতা যেন অনেকটা নিশ্চিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, স্বামীর প্রতি নারীর একান্ত অধিকারের বিষয়টি এখানে প্রকাশিত হয়েছে। সমস্ত অভিমান ঝেড়ে ফেলে আশা যেন মহেন্দ্রকে আবার নতুন রূপে পেয়েছিল। বিনোদিনী ছাড়া তার সংসারকে তার কাঁটাহীন মনে হয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালেই ফিরে আসলে আশালতা সংকুচিত হয়ে পড়ে। আশার হৃদয়ের এই সংকীর্ণতা দূর করতে চেয়েছিল মাসিমা অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা তাকে উপদেশ দিয়েছিল-

> "চুনি যদি সুখী হতে চাস তবে সব কথা মনে রাখিস নে। অন্যকে দোষি করিয়া যেটুকু সুখ, দোষ মনে রাখিবার দুঃখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি।"[১৫]

তবে এই উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ নারী চরিত্রের মতোই আশার মনের কথা উদ্ভাসিত হয়েছে এইভাবে-

> "মাসিমা আমি মনে কিছু পুষিয়া রাখিতে চাই না, আমি ভুলিতেই চাই, কিন্তু ভুলিতে দেয় না যে।"[১৬]

তবে শেষ পর্যন্ত আশা-মহেন্দ্রর সংসারের সুখ ফিরে এসেছে এবং প্রতিটি চরিত্রের শুভ দিক প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসে। 'চোখের বালি' উপন্যাস সেই সময়ে সাহিত্যে আধুনিকতার পথ উন্মোচন করেছিল। এই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন দিক তুলে ধরেছেন। যা কেবল ঘটনাকেই বর্ণনা করে না বরং ঘটনা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রতিটি চরিত্রের কথাকে টেনে এনে সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। এই উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী অন্নপূর্ণা সহ প্রধান চারটি চরিত্রকে ঘটনা কিভাবে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তাদের আঁতের কথাকে প্রকাশিত করেছে তারই চিত্র উদ্ভাসিত করেছেন ঔপন্যাসিক।

তথ্যসূত্র:

১. বক্সী, অমিয়, চোখের বালি (সম্পাদিত), মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০২, পরিমার্জিত সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ: ৫
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩, পৃ: ১১১
৩. বক্সী, অমিয়, চোখের বালি (সম্পাদিত), মডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০২, পরিমার্জিত সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ: ১৫
৪. তদেব, পৃ: ২২
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ ২০০৫-৬, পৃ: ৪৯৯
৬. বক্সী,অমিয়, চোখের বালি (সম্পাদিত), মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০২, পরিমার্জিত সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ: ৩৯
৭. তদেব, পৃ: ৯৪
৮. তদেব, পৃ: ৯৬
৯. তদেব, পৃ: ১০১
১০. তদেব, পৃ: ১০৪
১১. তদেব, পৃ: ১৫৩
১২. তদেব, পৃ: ১৪৮
১৩. তদেব, পৃ: ১৫১
১৪. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, পৃ:-৩৫
১৫. বক্সী,অমিয়, চোখের বালি (সম্পাদিত), মডার্ন বুকে এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০২, পরিমার্জিত সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ: ১৫৬
১৬. তদেব, পৃ: ১৫৬